৩৪বছর ৪মাস ৩দিন পর বিচার পেল বাংলাদেশ,

হারুন রশীদ আজাদ

ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী !স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতঃপর তার হত্যার চুড়ান্ত রায় পেয়েছেন বাংলাদেশের বিচার বিভাগ থেকে ।২১ বছর বিচার চাহিয়াবিচার তো দুরের কথা মামলা দায়েরের সুযোগও ছিলনা তার হত্যার মামলা দায়ের করতে যাওয়া বাদীকে তৎকালিন লালবাগ থানার ওসি বলেছিলেন ‘‘বেটা তুইও মরবি আমাকে মারবি ’’খন্দকার মোস্তাককে রাষ্ট্রপতির পদে বসিয়ে খুঁনিরা একটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল ২৬শে সেপ্টেম্ববর ১৯৭৫ সালে ।সেই অধ্যাদেশের শিরোনাম ছিল ‘‘ ইন্ডিমিনিটি বিল ’’ তথা রহিতকরণ আইন ! উক্ত আইনে বলাছিল ১৫আগষ্টের ঘটনায় হত্যাকারিদের আইনি বিচার থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল বা তাদের কৃতকর্ম আইনি বিচার ও অপরাধ রহিত করণ করা হইল ।
রাষ্ট্রের প্রথম অবৈধ সামরিক শাসক ও স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনিতে ‘‘দা , কাঁচি , কুঁড়াল , ও দড়ি দ্বারা ’’ এমন কষা গিট্টো বাঁধলেন যেন কেউ সেই গিট্টো খুলতে না পারেন ।সেই সংশোধনির ভাষাছিল এমন ‘‘১৯৭৫‘র ১৫ই আগষ্টের ভোর রাত থেকে ১৯৭৯ সালের অদ্য ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে বা ঘটানো হয়েছে তার সবকিছুই যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা হয়েছে এ বিষয়ে সকল কিছু বৈধভাবে হয়েছে বলিয়া বিবেচিত হইবে । তৎসম্মন্দে কোন আইনের আশ্রয়নেওয়া যাবেনা , সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবেনা , আদালতে বিচার চাহিয়া মামলা করা যাবেনা , অথবা মামলা করার জন্য আইন করা যাবেনা ।
অতএব সংবিধানিক ভাবে জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনিতে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন ।তবে প্রশ্ন থেকে যায় ২১ বছর পর তবে কি ভাবে সে বিচার সম্ভব হলো !সংবিধানিক নির্দেশ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি যে কোন অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইনের বৈধ অধিকারি তবে উক্ত অধ্যাদেশ বিল আকারে ৯০ দিনের মাধ্যমে সংসদে উত্থাপন করতে বাধ্যবাধকতা রয়েছে উক্ত সময়ে সংসদে সেই বিল বা অধ্যাদেশ উপস্থাপনে ব্যর্থ হইলে বিলিটি বিলিন বা অকার্য্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং ঐ বিলের কোন অস্থিত্ব থাকিবেনা । ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের পর জিয়া কর্তৃক ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিলে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের সময় পর্যন্ত সংসদ বসেনি আর ইন্ডিমিনিটি বিলটি ও ৯০ দিনের মধ্যে সংসদের অনুমোদন লাভ করেনি তাই ঐ বিলটির সুড়ঙ্গ পথে ২১বছর পর আওয়ামিলীগ বিচার চেয়ে আদালতে যান ।তাছাড়া মোস্তাক সংবিধানিক শব্দ ‘‘রহিতকরণ’’ব্যবহার করেছেন আর জিয়া পাকিস্তানি উর্দু শব্দ ‘‘ফরমানজারি’’ব্যবহারকরেছেন । এছাড়াও সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদের ২৭ ধারা মোতবেক রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকারের ভিত্তিতে আইনের আশ্রয় পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা আছে , তাই নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন হওয়া যে কোন আইন সংবিধান বর্হিভুত ।

কেন ১৫ই আগষ্ট এতবড় জগন্য হত্যা কান্ড

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সহ বাংলাদেশের ইতিহাস পাল্টে দেওয়ার অভিযানে দুর্দষ্য খুঁনি চক্রএকটি গোপন মিশন নিয়ে আঘাত হানে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ওস্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারিদের হত্যাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন । হত্যাকারীরা ক্ষমতায় থাকলে দেশ-বিদেশের কাছে চিহ্নিত হওয়ার বিষয়কে আড়াল করে তিন স্তরে ক্ষমতাদখল ও নিয়ন্ত্রনের জালবিছিয়ে মিশন শুরু করে ।ঘটনার রহস্যকে আড়াল ,দেশও জাতিকে বিভ্রান্তে ফেলে , খুঁনিচক্রের ছত্রছায়ায় পাকিস্তান বাংলাদেশের উপর তাদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠাকরে ।১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের পরর্বতি সব গুলি সরকার খুঁনি সন্ত্রাসিদের পদোন্নতি দিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থে পালন করে আসছিলেন ।

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে হত্যা কারিদের লালন পালনের একমাত্র উদ্দ্যেশ ছিল ৭১‘র চেতনাকে দাবিয়ে রেখে স্বাধীনতা বিরুধীদের পুর্ণবাসন করে একটি শক্তিশালি সন্ত্রাসি চক্রের মাধ্যমে আওয়ামিলীগকে ক্ষমতা থেকে দুরে রাখা ।উদ্দেশ্য ,আওয়ামিলীগ যেন ক্ষমতায় এসে মিনি পাকিস্তানের কন্সেপটা ভাংগতে না পারে ।পাকিস্তান ৭১‘র পরাজয়ের প্রতিশোধ হিসাবে ১৫ই আগষ্ট এবং ৩‘রা নভেম্বর পরিকল্পিত ভাবে বিশ্বাস ঘাতক সৈনিকদের ব্যবহার করে । মুক্তিযুদ্ধের সময় বন্দি অবস্থায় তিনবার বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগারে হত্যা ও সেই কারাগারেই কবর খুঁড়ে তাকে দেখিয়েছিল , কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো বার বার থামিয়েছিল সেই হত্যা প্রক্রিয়া । ভুট্টোর যুক্তিছিল বাংলাদেশের মানুষের কাছে ‘‘শেখ মুজিব যত প্রিয়ই হউক আমাদের কাছে একজন মুজিব , আমরা যদি এক মুজিবকে হত্যাকরি আর পাকিস্তান যদি যুদ্ধে হেড়ে যায় তবে পাকিস্তানি একটি সৈনিকও বাংলার মাটিতে বাঁচতে পারবেনা । তাই মুজিবকে তার দেশেই আমরা হত্যাকরে বদলানেব কারণ সে দেশে আমাদের অনেক সর্মথক রয়েছে ।

আত্মস্বীকৃত খুঁনি ফারুক-রশীদ

খুঁনি ফারুক নিজে বলেছে আমি ‘‘শেখ মুজিব’’কে ১৯৭২ থেকেই হত্যার সিদ্ধান্ত নেই । এক সময় হেলিকপ্টারে করে টুঙ্গিপাড়ায় যাত্রায় হেলিকপ্টারে চালক হতে চেষ্টাকরে ব্যর্থহন তিনি ।তার বক্তব্যে সে পত্রিকায় বলেছিলেন আমি আত্মঘাতি পথে নিজের জীবন দিয়ে হলেও তাকে হত্যার পথ বেছেনিয়েছিলাম । পাকিস্তানে লেখাপড়া করা উর্দু ভাষি ফারুক অর্ধবাংলায় ইত্তেফাক পত্রিকায় সাক্ষাতে তার প্রেসিডেন্ট পদে দাড়ানোর ব্যয় সম্মন্দে বলেছিলেন শুরুতেই তিনকোটি টাকা ব্যয় হয়েছে । শত কোটি টাকা ব্যয়ের সেই নির্বাচনে ফারুক যে ভোট পেয়েছিল তার প্রতিটি ভোটের খরচ দেখিয়ে একটি পত্রিকায় প্রতিবেদন ও ছাপা হয়েছিল । একজন স্বঘোষিত খুঁনি বাংলাদেশের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী !! অবাক করা সেই ইতিহাস !আজ মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন যে দেশে এতবড় একটা হত্যার ঘটনা বিশ্ব বিবেক কে হতাশ করেছে সেই ঘটনার নায়করা বুঁক ফুলিয়ে নির্বাচনকরে রাজনীতির মাঠ ও দেশের সংবিধানকে বৃদ্ধাআঙ্গুলি দেখিয়ে যাখুশি তা-ই করে বেড়িয়েছে।

পাকিস্তানথেকে শুরু করে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও আওয়ামি লীগকে তথা জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা থেকে দুরে রাখার সকল রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার ও অস্ত্রশক্তি ব্যবহার করেছে জন্মশত্রু পাকিস্তান । বিশ্বাস ঘাতকেরারাজনৈতিক শব্দ ব্যবহার করে দেশ ও জাতিকে সবদিক থেকে দেউলিয়া করেছিল । এখনো সংখ্যাধিক খুঁনিরা বাইরে থাকার কারণে রাষ্ট্রের প্রসাশন বিচার বিভাগ আতংকে কাটাচ্ছে !পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার কথা বার বার আসছে তবু মুখ খুলছেনা পাকিরা ।পাকিস্তানের ভুমিতে বসে একের পর এক সন্ত্রাসি কর্মকান্ড চালাচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে । লস্করে তৈয়বা সংগঠণটি কাশ্মিরের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে এখন আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাসি সংগঠণে পরিনত হয়েছে । জিয়ার শাসনামলে ফিলিস্তীনি যুদ্ধের নামে ২০হাজার বাংলাদেশী যুবককে মৃত্যুরমুখে ঠেলে দিয়েছিলেন মেঃ জলিল ও খুঁনি ফারুক রশীদ । হাজার হাজার যুবক অর্থাভাবে প্রাণ দিয়েছিল অন্যের দেশ বাঁচাতে গিয়ে ।আর সেই সুত্রে অগনিত অর্থ হাতিয়ে নিয়েছিল দস্যুর দল ।

এরপর কি হবে ?

আজ ১৯শে নভেম্বর ২০০৯ বিচারিক আদালতের রায় উচ্চ আদালত তথা সুপ্রীমর্কোট বহাল রাখার সুত্রে হত্যাকারিরা ২৮দিনের মেয়াদে ২টি সুযোগ লাভ করিতে পাযে ১। শাস্তি বহাল রাখা আপিল বিভাগে রিভিউ বা পুর্ণবিবেচনার সুযোগ নিতে পারে । ২ । রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে পারে ।তবে পলাতক খুঁনিরা আইনের আর কোন সুযোগ লাভ করিবেনা ।ফৌজদারি আইনের ৩০২ ধারায় সকল খুঁনি চক্র অপরাধের শাস্তি হিসাবে মৃত্যুবরণ করবে ।